গবাদিপশুর ওলান ফোলা, প্রজনন ও বিপাকীয় রোগ ব্যবস্থাপনা

প্রাণিসম্পদ ও ডেইরি উন্নয়ন প্রকল্প (এলডিডিপি)
প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর
মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়।

গবাদিপশুর ওলান ফোলা, প্রজনন ও বিপাকীয় রোগ ব্যবস্থাপনা

সার্বিক তত্ত্বাবধানে

মো: আব্দুর রহিম
প্রকল্প পরিচালক (যুগ্ম সচিব)

কারিগরী দিক নির্দেশনায়

ড. মো: গোলাম রব্বানী
চীফ টেকনিক্যাল কো-অর্ডিনেটর

রচনা ও সম্পাদনায়

ডাঃ অরবিন্দ কুমার সাহা
ড. মোঃ শাহজাহান আলী খন্দকার
ডাঃ বি এম আব্দুল হান্নান
ড. এবিএম মুস্তানুর রহমান
ড. মোঃ শাকিফ-উল-আযম
কল্যাণ কুমার ফৌজদার

প্রকাশনায়

প্রাণিসম্পদ ও ডেইরি উন্নয়ন প্রকল্প (এলডিডিপি)
প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর
কৃষি খামার সড়ক, ফার্মগেট, ঢাকা-১২১৫।

প্রকাশকাল

ডিসেম্বর, ২০২১ খ্রীঃ

মুখবন্ধ

প্রাণিজাত পণ্যের উৎপাদন বৃদ্ধি, প্রাণিজাত পণ্যের মার্কেট লিংকেজ ও ভ্যালু চেইন উন্নয়ন, ক্ষুদ্র ও মাঝারি খামারিদের জন্য জলবায়ু পরিবর্তনের ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা, নিরাপদ প্রাণিজ খাদ্য উৎপাদন এবং বেসরকারি উদ্যোক্তাদের সক্ষমতা বৃদ্ধির মাধ্যমে প্রাণিসম্পদ খাতে টেকসই প্রবৃদ্ধি অর্জনের লক্ষ্যে প্রাণিসম্পদ ও ডেইরি উন্নয়ন প্রকল্প (এলডিডিপি) বাংলাদেশ সরকার এবং বিশ্বব্যাংকের যৌথ অর্থায়নে মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়ের অধীনে প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর কর্তৃক বাস্তবায়িত হচ্ছে। প্রকল্পটির কার্যক্রম দেশের ৬১ টি জেলার ৪৬৫ উপজেলায় (৩ টি পার্বত্য জেলা ও উপজেলা বাদে) ১জানুয়ারি ২০১৯ থেকে ৫ বছর মেয়াদে বাস্তবায়নের জন্য নির্ধারিত। এই প্রকল্প বাস্তবায়নের মাধ্যমে তৃণমূল পর্যায়ের প্রাণিসম্পদ খাতে টেকসই উন্নয়ন, কর্মসংস্থান সৃষ্টি, নারীর ক্ষমতায়ন, প্রাণিজ আমিষ দুধ, ডিম ও মাংসের চাহিদা পূরণ করে প্রাণিজাত পণ্য রপ্তানি করা সম্ভব হবে এবং দেশকে ২০৪১ সালের মধ্যে উন্নত দেশের সারিতে পদার্পণে অগ্রণী ভূমিকা পালন করবে বলে আশা করা যায়। প্রকল্পের প্রাণিসম্পদ উৎপাদনকারী খামারী কৃষকদের জ্ঞান ও দক্ষতা উন্নয়নে গবাদি পশুর ওলান ফোলা, প্রজনন ও বিপাকীয় রোগ ব্যবস্থাপনা বিষয়ে বিশেষ প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা রয়েছে। প্রশিক্ষণকে ফলপ্রসূ করতে সহায়ক হিসাবে এ বুকলেটটি প্রণয়ন করা হয়েছে। প্রশিক্ষণ গ্রহণের মাধ্যমে প্রকল্পের খামারী তাদের খামারের রোগব্যাধি নিয়ন্ত্রণ ও উন্নত ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে খামারের উৎপাদন ও আয় বৃদ্ধিতে বিশেষ অবদান রাখবে বলে আমি মনে করি।

এ বুকলেটটি রচনায় সংশ্লিষ্ট সকলকে আমি আন্তরিক ধন্যবাদ জানাচ্ছি।

মো: আব্দুর রহিম
প্রকল্প পরিচালক (যুগ্ম সচিব)
প্রাণিসম্পদ ও ডেইরী উন্নয়ন প্রকল্প (এলডিডিপি)
প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর

গাভীর ওলান ফোলা রোগ (Mastities) ব্যবস্থাপনা

গাভীর ওলানের টিস্যুর প্রদাহকে ওলানফোলা রোগ বা ম্যাস্টাইটিস বলে। সাধারনত: ব্যাকটেরিয়া বাটের ছিদ্র পথে ওলানে প্রবেশ করে বংশবিস্তার ও টক্সিন সৃষ্টি করে ওলানের গ্রন্থিসমূহে প্রদাহ সৃষ্টি করে। ব্যাকটেরিয়া ছাড়াও ভাইরাস, ফাংগাস এবং আঘাতের কারণেও ওলান প্রদাহ হতে পারে। গাভীর দুধ উৎপাদন হ্রাস, দুধ বাতিল হওয়া, ওলানের বাঁট নষ্ট হয়ে যাওয়া, দুগ্ধবতী গাভী বাতিল হওয়া এমনকি গাভীর মৃত্যু হতে পারে যার ফলে খামারী অর্থনৈতিকভাবে ক্ষতিগ্রস্থ হয়ে থাকে।

লক্ষণ: রোগের প্রকোপের উপর ভিত্তি করে ওলান ফোলা রোগকে তিন ভাগে ভাগ করা হয়, যেমন-নাতি তীব্র, তীব্র ও অতি তীব্র।

নাতি তীব্র লক্ষণ: দুধের পরিবর্তন ছাড়া ওলানের মৃদু প্রদাহের উপসর্গ দেখা যায়।

তীব্র লক্ষণ: আক্রান্ত বাট হতে দুধের সাথে ছানা, সর বা জমা দুধ দেখা যেতে পারে এবং আক্রান্ত বাটের উপরের অংশ ফুলে যেতে পারে।

অতি তীব্র লক্ষণ: অস্বাভাবিক দুধ, ওলানের অংশ বিশেষ অথবা সম্পূর্ণ ওলান ফুলে যাওয়া, ওলান গরম হয়ে যাওয়া, ওলানে ব্যাথা অনুভুত হওয়া, গাভীর শরীরে জ্বর আসতে পারে, খাদ্যে অরুচি, শরীরে পানি শুন্যতা, বিষন্নতা ও মৃত্যুও হতে পারে।

রোগের লক্ষণ ছাড়া ম্যাস্টাইটিস কে ইংরেজীতে সাবক্লিনিক্যাল ম্যাস্টাইটিস বলে। এধরনের ম্যাস্টাইটিস-এর সংখ্যা অত্যন্ত বেশী এবং এর ফলে খুব বেশী আর্থিক ক্ষতি হয়ে থাকে। একদিকে যেমন দুধ উৎপাদন কমে যায় অপর দিকে অন্যান্য সুস্থ গাভীতে সংক্রমন ঘটায়। যদি কোন খামারে একটা গাভিতে লক্ষণসহ ম্যাস্টাইটিস দেখা যায় তবে সে খামারে ১৫ থেকে ৪০ গাভীতে লক্ষণছাড়া ম্যাস্টাইটিস থাকতে পারে।

অর্থনৈতিক ক্ষতি: ক) দুধ উৎপাদন কমে যাওয়া; খ) বাঁট বা ওলান নষ্ট হয়ে যাওয়া; গ) দুধের মান খারাপ হওয়ায় মূল্য কম পাওয়া; ঘ) বিপুল চিকিৎসা ব্যয়; এবং ঙ) পশু-মৃত্যুর কারণে আর্থিক ক্ষতি হওয়া।

রোগ নির্নয়: ক) লক্ষণ সমূহ দেখে রোগ নির্ণয়; খ) সিএমটি যন্ত্র দিয়ে দুধ পরীক্ষার মাধ্যমে রোগ নির্নয় গ) যন্ত্রের সাহায্যে দুধের সোমাটিক কোষ গনণার মাধ্যমে রোগ নির্ণয় ঘ) পরীক্ষাগারে দুধের বিভিন্ন পরীক্ষার মাধ্যমে রোগ নির্ণয় করা যায়।

প্রতিরোধ ব্যবস্থা: 'ওলান ফোলা' রোগের লক্ষণ দেখা দেয়ার পর চিকিৎসা প্রদান লাভজনক হয় না। সে কারণে রোগ প্রতিরোধ ব্যবস্থা নেয়া উত্তম।

রোগ প্রতিরোধ ব্যবস্থা সমূহ নিম্নরুপ হতে পারেঃ

ক) গাভীর পরিবেশ ব্যবস্থাপনাঃ

ঘরের মেঝে পরিস্কার, নিয়মিত জীবানু নাশক ব্যবহার করা, প্রতিটি গাভীর জন্য পর্যাপ্ত যায়গা দেয়া, মেঝেতে পরিস্কার খড়ের বিছানা বা জীবানু মুক্ত করণ সহ ম্যাট ব্যবহার করা, গাভীর চলাচলের যায়গা পরিস্কার রাখা, ঘরে পর্যাপ্ত আলো বাতাস প্রবেশের ব্যবস্থা রাখা, গাভীর ঘর অতিরিক্ত গরম ও স্যাঁতসেঁতে অবস্থা মুক্ত রাখা, দুধ দোহনের পর গাভীকে দাড়িয়ে রাখা সেক্ষেত্রে পানি ও খাদ্য দেয়ার অভ্যাস করা। পরিবেশ পরিস্কার রাখার স্বার্থে ঘর থেকে দিনে দুবার গোবর সরিয়ে নেয়া। সপ্তাহে কমপক্ষে একদিন করে জীবানুনাশক ঔষধ স্প্রে করা।

খ) উপযুক্ত দুধ দোহন পদ্ধতি বজায় রাখাঃ

দুধ দোহনের আগে দোহনকারীর হাত জীবিানুনাশক দিয়ে পরিস্কার করা। জীবানু নাশক দিয়ে বাট পরিস্কার ও শুকনা রাখা, জীবানুমুক্ত কাপড় বা তোয়ালে দিয়ে ওলান মুছে ফেলা, দুধ দোহনের পর বাট পূন: জীবানুমুক্ত রাখা (ক্লোরহেক্সাডিন ০.২% সলুসন ব্যবহার করা যায়, এর সাথে ১৫% গ্লিসারিন মিশিয়ে ব্যবহার করলে বাট নরম থাকে), নিয়মিত বাট ও ওলানে জীবানু নাশক স্প্রে করা, বাছুরকে একাধিক গাভীর বাট থেকে দুধ খাওয়া থেকে বিরত রাখা, দুধ দোহনের সময় ব্যবহৃত তেল বা ভ্যাসলিনের পাত্র পৃথক পৃথক রাখা, ওলান থেকে সম্পূর্ন দুধ দোহন করে নেয়া, ওলানফোলা রোগে আক্রান্ত গাভী পৃথক রেখে চিকিৎসা করা এবং সব শেষে দুধ দোহন করা, অন্তত: ১৫ দিন পর পর দুধ পরীক্ষা করে সুস্থতা নিশ্চিত হওয়া।

গ) মেশিন দ্বারা দুধ দোহনের ক্ষেত্রে সতর্কতা অবলম্বনঃ

- মেশিন প্রস্তুতকারী প্রতিষ্ঠানের নির্দেশনা অনুসরণ করা;
- মেশিনের কাপ ও অন্যান্য অংশ জীবানূমুক্ত নিশ্চিত করা, ফাঁটা বা জোড়া দেয়া কোন পাইপ ব্যবহার না করা;
- প্রতিটা গাভীর দুধ দোহনের পর দুধ দোহন মেশিন উত্তমরুপে পরিস্কার করা;
  নিয়মিত ভাবে মেশিন পরীক্ষা করা, মূল্যায়ন করা ও উপযুক্ত ব্যবস্থাপনায় রাখা;
- মেশিনের রবার, প্লাস্টিক, লাইনার ইত্যাদি নিয়মিত পরীক্ষা ও পরিবর্তন করা।

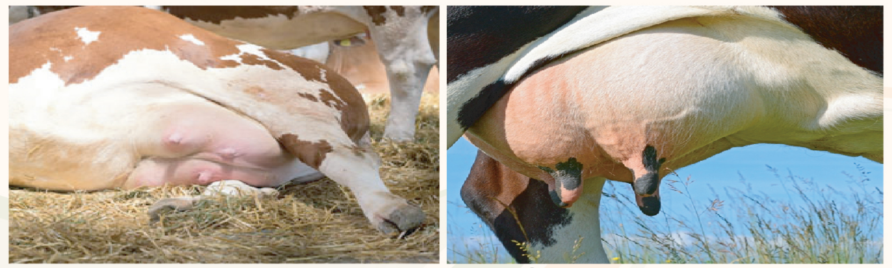

চিত্র ঃ ম্যাস্টাইটিসে আক্রান্ত গাভীর ওলান

চিত্র ঃ সিএমটি কিট

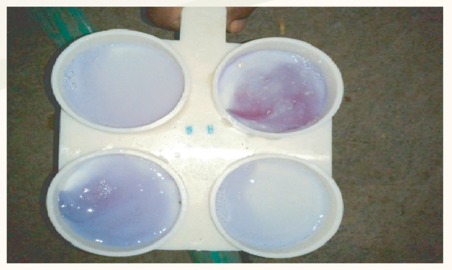

চিত্র ঃ সিএমটি পরীক্ষায় দুধের পরিবর্তন

ঘ) সঠিক রেকর্ড সংরক্ষণঃ

- ম্যাস্টাইটিসে আক্রান্ত গাভীর তথ্য সংরক্ষণ করা- গাভীর আইডি, আক্রান্ত ওলানের অংশ, চিকিৎসার বিবরণ, সোমাটিক কোষের সংখ্যা, সম্ভব হলে জীবানুর বৃত্তান্ত উল্লেখ রাখা;
- সাবক্লিনিক্যাল ম্যাস্টাইটিস এর কোন ইতিহাস থাকলে তা উল্লেখ রাখা।

ঙ) সঠিক চিকিৎসা ব্যবস্থাপনাঃ

- চিকিৎসা প্রদানের পূর্বে দুধের নমুনা সংগ্রহ পূর্বক কালচার ও সেনসিটিভিটি পরীক্ষা করণ;
- প্রাণি চিকিৎসকের পরামর্শমত ঔষধ প্রয়োগ এবং এর প্রত্যাহার কাল অনুসরণ করণ;
- চিকিৎসাকালীন সময়ে গাভীকে পৃথক রেখে চিকিৎসা প্রদান;
- অসুস্থ্য গাভী হতে সুস্থ্য গাভীতে সংক্রমন রোধ কল্পে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থাগ্রহন।

চ) বায়োসিকিউরিটি ব্যবস্থাপনাঃ

- নুতন গাভী ক্রয় করার ক্ষেত্রে সম্ভব হলে দুধ পরীক্ষা করতে পারলে ভালো হয়।
- নুতন ক্রয়কৃত গাভী খামারে প্রবেশের পূর্বে পৃথক স্থানে রেখে পর্যবেক্ষণ করে খামারে প্রবেশ করাতে হবে।
- ওলানের জীব নিরাপত্তার বিষয়ে পর্যবেক্ষণ করতে হবে।

ছ) নিয়মিত ওলানের-স্বাস্থ্য পরীক্ষা করণঃ

- দুধের সোমাটিক কোষ পরীক্ষাকরণ ও লিপিবদ্ধকরণ;
- দুগ্ধকালীন সময়ের বিশেষ করে প্রথম দিকে ওলানের প্রদাহ বা ফোলার লক্ষণ পর্যবেক্ষণ করা;
- রোগ লক্ষণযুক্ত গাভীর প্রতি লক্ষ রাখা ও বকনার জন্য বিশেষ নজর দেয়া।

গবাদিপশুর প্রজনন সংক্রান্ত রোগ (Reproductive Diseases) ব্যবস্থাপনা

প্রজনন সংক্রান্ত রোগ সাধারনতঃ ধীর গতিতে প্রকাশ পায়, সে কারণে অনেক সময় রোগের উপস্থিতি অজ্ঞাত থেকে যায়, অথচ অর্থনৈতিক বিবেচনায় গবাদিপশুর ক্ষেত্রে প্রজনন সংক্রান্ত রোগ খুবই গুরুত্ব বহন করে। পুরুষ পশুর ক্ষেত্রে অনেক সময় জানাই যায়না। প্রজনন সংক্রান্ত রোগ সচারচার পশুর মৃত্যু ঘটায় না তবে ব্যাপকভাবে উৎপাদনশীলতায় ব্যাঘাত সৃষ্টিকরে এবং অন্যান্য সুস্থ পশুর জন্য হুমকি হিসেবে থেকে যায়।

প্রজনন সংক্রান্ত রোগ প্রতিরোধ করতে হলে সর্বদা সতর্ক থাকা কর্তব্য। নুতন পশু পৃথক রেখে পর্যবেক্ষণ করার পর খামারে সুস্থ পশুর সাথে রাখা যাবে। প্রযোজ্য ক্ষেত্রে রোগ প্রতিরোধ টিকা দিয়ে রাখতে হবে এবং স্বাস্থ্য গত বিষয়ে ভেটেরিনারিয়ানের সাথে যোগাযোগ রাখতে হবে।

প্রজনন সংক্রান্ত প্রধান রোগগুলো হলো- ব্রুসেলোসিস, লেপটোসপাইরোসিস, ভিব্রিওসিস, ট্রাইকোমোনিওসিস, বোভাইন ভাইরাল ডাইরিয়া কমপ্লেক্স, ইনফেকসাস বোভাইন রাইনোট্রাকাটিস।

গবাদিপশুর ব্রুসেলোসিস (Brucellosis) :

ব্রুসেলোসিস গবাদিপশুর একটি সংক্রামক রোগ যা সংক্রমিত প্রাণির সংস্পর্শে এসে সুস্থ প্রাণি সংক্রমিত হয়। ব্রুসেলা ব্যকটেরিয়া কতকগুলো উপপ্রজাতী যেমন- ব্রুসেলা এবোরটাস, ব্রুসেলা মেলিটেনসিস, ব্রুসেলা সুইচ প্রভৃতি এ রোগের কারন। গৃহপালিত প্রাণির মধ্যে গরু, মহিষ, ছাগল, ভেড়া, ঘোড়া, উট, কুকুর এবং শুকর এ রোগে আক্রান্ত হতে পারে। বন্য প্রাণির মধ্যে হরিণ, বনগরু, ওয়াটার বাফেলো এমনকি সামুদ্রিক স্তন্যপায়ী প্রাণি ব্রুসেলোসিস রোগে আক্রান্ত হতে পারে। ব্রুসেলোসিস রোগকে 'ব্যাঙ্স ডিজিস'ও বলা হয়।

লক্ষণঃ

- গর্ভপাত ঘটে তবে একটি সংক্রমিত গাভীর একবার গর্ভপাত হওয়ার পর পরবর্তীতে আর গর্ভপাত নাও হতে পারে;
- অল্প সংখ্যক গাভী সাধারনভাবে এ রোগ প্রতিরোধ করতে পারে এবং খুব কম সংখ্যক গাভী আপনা- আপনি সুস্থ হয়ে উঠে;
- রোগের সুপ্তিকাল বিভিন্ন হতে পারে তবে পশুর অবস্থার উপর নির্ভর করে;
- দুর্বল বাছুরের জন্ম;

- গর্ভ ফুল আটকে যাওয়া ও গর্ভ ফুলে সংক্রমন;
- ষাঁড়ের ক্ষেত্রে অন্ডকোষ ফুলে যাওয়া;
- পূন: পূন: জ্বর আসা;
- আর্থ্রাইটিস (গিটা প্রদাহ) ইত্যাদি।

চিকিৎসাঃ

প্রকৃত পক্ষে ব্রুসেলোসিস রোগের কোন চিকিৎসা নেই।

প্রতিরোধঃ

ব্রুসেলোসিস একটি খুব গুরুত্বপূর্ন রোগ সে কারণে বাংলাদেশসহ বিশ্বের প্রতিটি দেশেই এ রোগ প্রতিরোধের জন্য প্রয়োজনীয় আইন ও ব্যবস্থা রয়েছে। এতদসত্তেও এ রোগ জনস্বাস্থের জন্য হুমকী স্বরূপ। নিয়মিত পশু পরীক্ষা করা জরুরী এবং এ রোগ নির্মুলে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেয়া বাঞ্ছনীয়।

- সংক্রমিত পশুকে অতি দ্রুত খামার থেকে সরিয়ে ফেলা এবং প্রয়োজনে মেরে মাটিতে পুঁতে ফেলার নিয়ম রয়েছে;
- যেহেতু পোষা প্রাণি ও মানুষে সংক্রমিত হতে পারে সে ক্ষেত্রে রোগ সংক্রমণ প্রতিরোধ ব্যবস্থা বাড়িয়ে তুলতে হবে;
- প্রতিশেধক টিকা দিয়ে এ রোগ প্রতিরোধ করা যায়। উন্নত দেশে এ রোগে টিকা ব্যবহার করা হয়;
- আমাদের দেশে গবাদিপশুর জন্য কোন প্রতিষেধক টিকা পাওয়া যায়না।

চিত্র ঃ ব্রুসেলোসিসে আক্রান্ত গাভীর গর্ভপাত

গবাদিপশুর ল্যাপ্টোসপাইরোসিস (Laptospirosis) :

ল্যাপ্টোসপাইরোসিস ডেইরি এবং মাংস শিল্পে একটা মারাত্মক সংক্রামক রোগ। এ রোগ পশুর বন্ধাত্ব, গর্ভপাত এবং দুধ উৎপাদন হ্রাস করে যার ফলে প্রাণিসম্পদ শিল্প অর্থনৈতিকভাবে দারুন ক্ষতিগ্রস্থ হয়। এ রোগের জীবানু মানুষের শরীরে প্রবেশ করলে দারুণ মাথা ব্যাথাসহ ইনফ্লুয়েঞ্জার ন্যায় লক্ষণ প্রকাশ পায়। সাধারনত: দুগ্ধ খামারে কর্তব্যরত কর্মীগন আক্রান্ত পশুর প্রস্রাব হতে নিজে সংক্রমিত হতে পারে। তবে দুধ পাস্তুরিত করলে এ রোগের জীবানু মারা যায় সে কারণে প্রক্রিয়াজাত দুধে সংক্রমন হওয়ার সম্ভাবনা নেই।

ল্যাপটোসপাইরার দুই প্রকার গুরুত্বপূর্ণ জীবানু দ্বারা প্রাণি এবং মানুষ আক্রান্ত হয়ে থাকে। রোগের জীবানু সাধারনত: অসুস্থ প্রাণির প্রস্রাব ও গর্ভপাতের কারণে গর্ভফুল বা কোন তরল পদর্থের সংস্পর্শে আসলে সংক্রমন ঘটে। সাধারনত: পশু মাঠে চরে ঘাস খাওয়ার সময় সুস্থ ও অসুস্থ এবং বিভিন্ন প্রকারের পশুর মধ্যে রোগের সংক্রমন হয়ে থাকে।

রোগের লক্ষণ ঃ

- রোগের জীবানু দ্বারা আক্রান্ত হওয়ার ২-৭ দিনের মধ্যে দুগ্ধবতী গাভীর দুধ উৎপাদন কমে যায়;
- গাভীর ওলান নরম ও ছোট হয়ে যাওয়া এবং নীরস থলতলে হয়ে যাওয়া;
- শাল দুধের মত দুধ দেখা যায়। অনেক সময় সবকটি বাট হতেই লালচে রঙের দুধ আসতেও দেখা যায়;
- গাভীর মধ্যে অলসতা ও অনড় অবস্থা এবং ক্ষুধামন্দা ও গায়ে জ্বর থাকে;
- সাধারনত ৩-১২ সপ্তাহ গর্ভাবস্থায় গর্ভপাত হতে দেখা যায় তবে গর্ভাবস্থার শেষ তিন মাসের মধ্যে গর্ভপাত সবচেয়ে বেশী হয়ে থাকে;
- এছাড়াও ল্যাপ্টোসপাইরোসিস রোগে অপুষ্ট ও দুর্বল বাছুর জন্ম হতে দেখা যায়।

রোগ নির্নয়ঃ

রোগের লক্ষণ ও ল্যাবরেটরী পরীক্ষার মাধ্যমে রোগ র্ণির্ণয় করা যায়-

- রক্ত পরীক্ষার মাধ্যমে ল্যাপটোসপাইরা হার্ডজো জীবানু শনাক্ত করা যায়;
- দুধ ও প্রস্রাব নমুনা পরীক্ষা করে রোগ নিণয় করা যায়;
- গাভীর সিরাম পরীক্ষার মাধ্যমে রোগ নির্ণয় করা যায়;
- গর্ভপাত দ্রব্য পরীক্ষার মাধ্যমে রোগ নির্ণয় করা যায়।

চিকিৎসাঃ

এন্টিবায়োটিক চিকিৎসা দিয়ে ল্যাপ্টোসপাইরোসিস রোগ চিকিৎসা করা যায়। ল্যাপ্টপাসাইেরোসিস চিকিৎসা জন্য ষ্ট্রেপটোমাইসিন/ডাইহাইড্রো ষ্ট্রেপটোমাইসিন ব্যবহার করা যায়। অনেক ক্ষেত্রে মাত্র একবার ইনজেকশন প্রয়োগই যথেষ্ট। অভিজ্ঞ ভেটেরিনারিয়ানের পরামর্শেক্রমে এ রোগের চিকিৎসা করাতে হবে।

রোগ প্রতিরোধ ও নিয়ন্ত্রন ব্যবস্থাপনাঃ

খামার ব্যবস্থাপনা উন্নয়ন এবং সংক্রমন রোধে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ-

- নিয়মিত টিকা ও বুস্টার টিকা প্রদান প্রস্রাবের সাথে জীবানু নি:স্বরণ, দুধ উৎপাদন হ্রাস এবং গর্ভপাত থেকে রক্ষা করতে পারে।
- যদিও বর্তমানে বাংলাদেশে ল্যাপ্টোসপাইরোসিস রোগের প্রতিশেধক টিকা নেই;
- সাবধানতা স্বরূপ কৃত্রিম প্রজননের জন্য ব্যবহৃত সিমেনের সাথে ষ্ট্রেপটোমাইসিন যুক্ত করার নিয়ম আছে;
- খামারে কোন পশু সংক্রমিত হলে পৃথক রেখে চিকিৎসা প্রদান শেষে পূন: খামারে প্রবেশ করানো;
- হটাৎ করে ব্যাপক সংক্রমন দেখা দিলে সকল পশুকে এন্টিবায়োটিক চিকিৎসা প্রদান করা এবং সুস্থ পশুকে টিকা প্রদানের ব্যবস্থা নেয়া;
- খামারের জীব নিরাপত্তা ব্যবস্থা জোরদার করতে হবে।

চিত্র ঃ ল্যাপ্টোসপাইরোসিসে আক্রান্ত গাভী

গবাদিপশুর ভিব্রিওসিস (Vibriosis):

ভিব্রিওসিস গবাদিপশুর জন্য একটা মারাত্মক যৌন সংক্রামক রোগ যা পশুর বন্ধ্যাত্ব এবং গর্ভপাতের অন্যতম কারণ। গবাদিপশুর ভিব্রিওসিস রোগকে কম্পাইলোব্যকটেরিওসিস বা বিভিসি বা কম্পাইলোব্যাকটার সংক্রামক রোগও বলা হয়।

জীবানু সংক্রমনঃ

ভিব্রিও নামক ব্যকটেরিয়ার বিভিন্ন প্রজাতি থাকলেও ভিব্রিও ফিটাস নামক এক প্রকার ব্যাকটেরিয়া পুরুষ পশু হতে যৌন মিলনের মাধ্যমে গাভী বা বকনা গরুতে সংক্রমিত হয়। একবার যখন ষাঁড় গরু সংক্রমিত হয়ে পড়ে তখন সে কোন লক্ষণ ব্যতিরেকেই স্বাভাবিক অবস্থার ন্যায় অবস্থান করে, এবং জীবানু বহন করতে থাকে। সে কারণে যদি পূন; কোন গরুর সাথে যৌন মিলনে অংশ নেয় সেক্ষেত্রে স্ত্রী-পশু ভিব্রিওসিস রোগে আক্রান্ত হয়ে থাকে।

যদি কোন খামারে ভিব্রিওসিস রোগ প্রবেশ করে তবে দ্রুত অন্যান্য পশুতে ছড়িয়ে পড়ার সম্ভাবনা দেখা যায় যদি খামারের গরুতে ভিব্রিওসিস রোগের প্রতিশেধক টিকা প্রদান করা না থাকে। খামারে ভিব্রিওসিস রোগ দেখা দিলে প্রথম অবস্থায় গর্ভধারন হার প্রায় ৬৫% কমে যেতে পারে তবে পরবর্তিতে প্রাকৃতিক ভাবে রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা সৃষ্টির কারনে এ হার ৪০% পর্যন্ত হতে পারে। রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা সৃষ্টি হলেও তা এক বছরের মধ্যে পুন: রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা কমতে থাকে এবং সে পশুতে পুন: সংক্রমন দেখা দিতে পারে। দীর্ঘ দিন যাবৎ খামারে ভিব্রিওসিস রোগ সংক্রমন থাকলে সে খামারে গরুর গর্ভধারন হার কমতে থাকে এবং সুস্থ বকনা সংক্রামিত ষাঁড়ের সাথে যৌন মিলন ঘটলে সে সকল বকনা ভিব্রিওসিস রোগে আক্রান্ত হয়ে পড়ে।

গবাদিপশুর খামারে ভিব্রিওসিস রোগ সংক্রমন রোধে গরমে আসা গাভী বা বকনাকে কৃত্রিম প্রজননের মাধ্যমে সুস্থ ষাঁড়ের সিমেন বা এমব্রায়ো প্রয়োগের মাধ্যমে গর্ভ ধারনের ব্যবস্থা নেয়া উচিৎ। সাধারনভাবে স্ত্রী পশু গরমে আসতে থাকে তবে অনেক ক্ষেত্রে ইস্ট্রাস চক্র অনিয়মিত হয়ে পড়ে। কিছু কিছু ক্ষেত্রে অসুস্থ পশু দীর্ঘ দিন ভিব্রিওসিস রোগে আক্রান্ত থাকলে স্বাভাবিক ভাবেই রোগের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ ক্ষমতা গড়ে উঠে এবং গর্ভধারনও করতে পারে। কিছু কিছু ক্ষেত্রে ভিব্রিওসিস রোগে আক্রান্ত হয়ে গাভী বা বকনা স্থায়ী ভাবে বন্ধ্যা হয়ে যেতে পারে।

লক্ষণ সমূহঃ

সাধারনভাবে ভিব্রিওসিস রোগের বাহ্যিক লক্ষণ দেখা না যাওয়ার কারণে রোগ অজানা থেকে যায়। সংগোপনে এ রোগের জীবানু অবস্থান করার কারণে রোগের অবস্থান অজানা থেকে যায় কিন্তু প্রকৃত পক্ষে খামারের ক্ষতি করতে থাকে। এ রোগের প্রধান প্রধান লক্ষণ সমূহ :-

- গর্ভপাত ঘটে। সাধারনত ৬ মাস গর্ভকালে গর্ভপাত হয়ে থাকে। তাছাড়া ভ্রুণের মৃত্যু হয়ে থাকে;
- নিম্ন গর্ভধারন হার;
- আন্ত: গর্ভধারণ সময় বেড়ে যায় এবং;
- জরায়ুতে প্রদাহ হয়ে থাকে।

রোগ নির্ণয়ঃ

- রোগের ইতিহাস থেকে রোগ অনুমান করা যায়;
- আক্রান্ত গাভী বা বকনার জরায়ুর শ্লেষ্মা ল্যবরেটরি পরীক্ষার মাধ্যমে এন্টিবডির উপস্থিতি হতে রোগ নির্ণয় করা যায়। গর্ভপাত জনিত গর্ভফুল এবং বাচ্চা হতেও নমুনা সংগ্রহ করে পরীক্ষা করা যায়;
- ল্যাবরেটরি পরীক্ষার মাধ্যমে ষাঁড়ের অসুস্থতা পরীক্ষা করা যায় তবে সব ক্ষেত্রে নির্ভর যোগ্য নাও হতে পারে।

চিকিৎসা ঃ অভিজ্ঞ ভেটেরিনারিয়ানের পরামর্শেক্রমে এ রোগের চিকিৎসা করাতে হবে। চিকিৎসার জন্য এন্টিবায়োটিক ব্যবহার করা যায়।

রোগ প্রতিরোধ ঃ

ভিব্রিওসিস রোগ প্রতিরোধ কল্পে নিম্নরুপ ব্যবস্থা নিতে হবে-

- প্রজনন ষাঁড়কে বছরে একবার নিয়মিত রোগ প্রতিরোধ টিকা প্রদান করতে হয়। প্রথম টিকা প্রদান করার পর ৪-৬ সপ্তাহ পর পূনরায় বুস্টার টিকা প্রদান করতে হয়। স্ত্রী পশুর জন্যও টিকা প্রদান করা যায়। যদিও আমাদের দেশে ভিব্রিওসিস রোগের টিকা এখন পর্যন্ত পাওয়া যায় না;
- ষাঁড়ের নিয়মিত রোগ পরীক্ষা করতে হবে যা খামার রোগমুক্ত রাখতে সাহায্য করে। প্রয়োজনে অপেক্ষাকৃত কম বয়সের ষাঁড় প্রজননের জন্য ব্যবহার করতে হবে;
- নুতন কোন ষাঁড় সংগ্রহ করতে চাইলে খামারে প্রবেশ করানোর আগেই ল্যবরেটরি পরীক্ষা করায়ে নিতে হবে;

- প্রয়োজনে এন্টিবায়োটিক চিকিৎসা প্রদান করতে হবে;
- গবাদিপশুকে প্রাকৃতিক প্রজনন না করায়ে কৃত্রিম প্রজনন ব্যবস্থা নিতে হবে এবং ডেইরি খামারে ষাঁড় পালন না করে পৃথকভাবে পালন করা উচিৎ।

চিত্র ঃ ভিব্রিওসিসে আক্রান্ত গাভী

চিত্র ঃ ভিব্রিওসিসে আক্রান্ত গাভীর গর্ভপাত জনিত ভ্রুন

গবাদিপশুর ট্রাইকোমোনিওসিস (Trichomoniasis):

ট্রাইকোমোনিওসিস গবাদিপশুর একটা যৌনরোগ যার মাধ্যমে ভ্রুনের মৃত্যু ও পশুর বন্ধ্যাত্বতা দেখা যায়, ফলে আন্ত: গর্ভধারনকাল বৃদ্ধি পায় এবং খামার অর্থনৈতিকভাবে ক্ষতিগ্রস্থ হয়। এ রোগটি সমগ্র বিশ্বব্যাপী বিদ্যমান।

রোগের কারণঃ

ট্রাইকোমোনাস ফিটাস নামে এক প্রকার প্রোটোজোয়া এ রোগের কারন।

ট্রাইকোমোনাস ফিটাস জীবানু পশুর যৌনাঙ্গে অবস্থান করে। যখন কোন রোগাক্রান্ত ষাঁড় দিয়ে প্রাকৃতিক নিয়মে গাভী/বকনাকে প্রজনন করানো হয় তখন সে স্ত্রী পশু ৩০-৯০ ভাগ ক্ষেত্রে ট্রাইকোমোনিওসিস রোগে আক্রান্ত হয়ে পড়ে। ষাঁড় গরু এ রোগের উপর খুব বেশী সংবেদনশীল। সাধারনত: গাভী আক্রান্ত হওয়ার পর স্বাভাবিক ভাবে ৩ মাসের মধ্যে রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা অর্জন করে এবং গাভী গর্ভধারনও করে থাকে, তবে এর রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বেশীদিন থাকে না সেকারণে গাভী পূন: রোগে আক্রান্ত হতে পারে। ট্রাইকোমোনিওসিস রোগে আক্রান্ত ষাঁড়ের সিমেনের মাধ্যমে কৃত্রিম প্রজননের দ্বারা স্ত্রী পশু এ রোগে আক্রান্ত হতে পারে।

রোগের লক্ষণঃ

- এ রোগের প্রধান লক্ষণের মধ্যে বন্ধাত্বতা এবং ভ্রুনের মৃত্যু অন্যতম। এর ফলে গাভীর বার বার গরম হওয়া, গর্ভপরীক্ষার ফলও নিম্ন হারের হয়ে থাকে;
- অনেক ক্ষেত্রে গর্ভধারন না করে জরায়ুর সমস্যা দেখা যায় যেমন, জরায়ুতে পুজ/পায়োমেট্রা, এন্ডোমেট্রাইটিস এবং মামিফাইড ফিটাস (জরায়ুতে মৃত শুকনা বাছুর);
- বাচ্চার মৃত্যু এবং গর্ভপাত গর্ভকালের প্রথম দিকে অর্থাৎ গর্ভকালের ৩ মাসের মধ্যে হয়ে থাকে;
- অনেক সময় জীবিত বাছুর সহ গর্ভপাত হতে দেখা যায় তাছাড়াও প্রজননের পর জরায়ুতে পুঁজ (পায়োমেট্রা) হতে দেখা যায়।

রোগ নির্ণয়ঃ

রোগের লক্ষন ও ইতিহাস রোগ নির্ণয়ের জন্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ। ল্যবরেটরি পরীক্ষার মাধ্যমে এ রোগ নির্নয় করা যায়। ল্যবরেটরিতে পিসিআর টেষ্ট করেও রোগ নিশ্চিত হওয়া যায়।

রোগের চিকিৎসা ঃ

ট্রাইকোমোনিওসিস রোগের উত্তম চিকিৎসা ব্যবস্থা নেই তবে অভিজ্ঞ ভেটেরিনারিয়ানের পরামর্শেক্রমে এ রোগের চিকিৎসা করানো যেতে পারে;

প্রতিরোধ ব্যবস্থা ঃ

- রোগ প্রতিরোধের জন্য আক্রান্ত ষাঁড় বাছাই করে বাতিল করা উত্তম;
- খামারের বয়স্ক ষাঁড় এমনকি সকল ষাঁড় বাতিল করে নুতন কম বয়সী ষাঁড় ব্যবহার করা উচিত;
- গাভী বা বকনা গরুকে কোন অবস্থাতেই রোগাক্রান্ত ষাঁড়ের কাছে নেয়া যাবে না;
- কৃত্রিম প্রজননে ব্যবহারের জন্য প্রয়োজনীয় এন্টিবায়োটিক সংমিশ্রণে সিমেন প্রক্রিয়াজাত করে ব্যবহার করা যায়;
- স্ত্রী পশুতে নিয়মিত টিকা প্রদান করে সংক্রমনের মাত্রা কমিয়ে আনা সম্ভব হলেও নিশ্চিত ভাবে রোগ মুক্ত করা বেশ কঠিন।

চিত্র ঃ ট্রাইকোমোনিওসিসে আক্রান্ত ষাঁড়

চিত্র ঃ আক্রান্ত পশু থেকে নমুনা সংগ্রহ

গবাদিপশুর বিপাকীয় রোগ (Metabolic Diseases) ব্যবস্থাপনা

বিপাকীয় রোগ বলতে কিছু প্রয়োজনীয় পুষ্টির ঘাটতিজনীত কারণে পশুর স্বাভাবিক বিপাকীয় প্রক্রিয়া গুলিতে ব্যাঘাত ঘটে এবং এক বা একাধিক লক্ষণের মাধ্যমে প্রকাশ পায়। এ অবস্থাগুলি সাধারণত: গর্ভাবস্থার শেষদিক, স্তন্যদান সময় বা শরীরবৃত্তীয় ধকল (Stress) এর সাথে সম্পর্কযুক্ত। অনেক সময় লক্ষণগুলি অন্য রোগের লক্ষণের ন্যায় প্রকাশ পায় অথবা একইসাথে একাধিক রোগও দেখা দিতে পারে, সেক্ষেত্রে পশুর রোগের প্রকপতা বা জটিলতা বৃদ্ধি পায়। সে কারণে এ রোগ গুলির প্রতিরোধ এবং চিকিৎসার স্বার্থে রোগ গুলির কারণসমূহ অবহিত হওয়া খুবই গুরুত্বপূর্ণ।

গবাদিপশুর মিল্কফিভার (Milk Fever)

মিল্কফিভার রোগকে বাংলায় দুগ্ধজ্বরও বলা হয়। ইংরেজীতে পাসচুরিয়েন্ট প্যারেসিস বা পোষ্ট পাসচুরিয়েন্ট হাইপোক্যালসিমিয়াও বলা হয়। মিল্কফিভার বা দুগ্ধজ্বর একটি অপ্রকৃত নাম, কারণ গবাদিপশুর এ রোগে কখনও জ্বর থাকে না। প্রকৃতপক্ষে গাভীর রক্তে ক্যালসিয়ামের পরিমান হটাৎ কমে গেলে মিল্কফিভারের লক্ষনসমূহ দেখা দেয়। সাধারণত: বাচ্চা প্রসবের প্রথম ২৪ ঘন্টার মধ্যে রোগ লক্ষণ দেখা যায় তবে বাচ্চা প্রসবের ২-৩ দিন পরও মিল্কফিভার রোগ দেখা দিতে পারে। তাছাড়াও বাচ্চা প্রসবের ২-৩ দিন আগেও এ রোগ হতে পারে। সাধারণত: বয়স্ক গাভীর (৫-১০ বছর বয়স) ক্ষেত্রে অর্থাৎ ৩য়, ৪র্থ ও ৫ম দুগ্ধ দান কালে এবং অধিক দুধ উৎপাৎদনকারী গাভীর ক্ষেত্রে এ রোগ বেশী দেখা যায়। দুগ্ধ জাতের মধ্যে ফ্রিজিয়ান ও জার্সী জাত খুব বেশী আক্রান্ত হয়ে থাকে। মিল্কফিভার রোগ লক্ষণ সহ এবং লক্ষণ ব্যতিরেকে দু'ভাবেই প্রকাশ পেতে পারে। মিল্কফিভার রোগ অন্যান্য বিপাকীয় ও সংক্রামক রোগ যেমন- কিটোসিস্, জরায়ু প্রদাহ ইত্যাদি রোগের সম্ভাবনা বাড়িয়ে দেয়। ভীষণভাবে আক্রান্ত গাভীর মধ্যে শতকরা ৫ ভাগ গাভী মারা যেতে পারে।

দুগ্ধদানকারী গাভী খাদ্য হতে এবং হাড়ে জমাকৃত ক্যালসিয়াম হতে রক্তে কেলসিয়াম সংগ্রহ করে থাকে। তাছাড়া খাদ্যনালী হতে শোষণ, হাড় হতে পুন:শোষন প্রক্রিয়ায় ব্যাঘাত হলে (যা হরমোন দ্বারা নিয়ন্ত্রিত) রক্তে ক্যালসিয়ামের ঘাটতি দেখা দেয়। এ প্রক্রিয়ার সাথে ফসফরাস, ম্যাগনেসিয়াম এবং ভিটামিন ডি এর স্বল্পতা সম্পৃক্ত।

গাভীর কলষ্ট্রাম বা শালদুধ এবং দুধ উৎপাদন শুরুর প্রারম্ভে স্বাভাবিক অবস্থার তুলনায় হটাৎ করে প্রায় ৪০০গুন ক্যালসিয়ামের প্রয়োজন পড়ে, এ পরিমান ক্যালসিয়াম খাদ্য ও হাড় হতে শোষনে ব্যাঘাত হলে মিল্ক ফিভার রোগের লক্ষণাদি দেখা দেয়।

রোগের কারণঃ

- গাভীর শরীরে রক্তের মধ্যে ক্যালসিয়ামের পরিমান কমে গেলে মিল্কফিভার রোগের লক্ষণ দেখা দিতে থাকে;
- বাচ্চা জন্মের পর পরই দুধের সাথে অধিক পরিমান ক্যালসিয়াম শরীর থেকে বেরিয়ে যাওয়ার কারণে ক্যালসিয়ামের ঘাটতি দেখা যায়;
- অধিক পরিমান কলস্ট্রাম তৈরীর ক্ষেত্রে খাদ্য এবং হাড় থেকে ক্যালসিয়াম শোষনের তারতম্য দেখা দিলে ঘাটতি হতে পারে;
- গাভীর শরীরে ভিটামিন-ডি এবং ক্ষুদ্রঅন্ত্রে অম্লতার ঘাটতি হলে;
- অনেক সময় রক্তে ফসফরাস ও ম্যাগনেসিয়ামের ঘাটতির সাথে ক্যালসিয়ামের ঘাটতির সম্পৃক্ততা থাকে;
- এ সকল কারণ ছাড়াও যদি গাভী খুব বেশী শারীরিক ধকলের সম্মুখীন হয়, অতিরিক্ত পরিশ্রম, দীর্ঘ পথ পরিবহন, হঠাৎ সবুজ ঘাসে অক্সালেট বৃদ্ধি, কাঁচা ঘাসের বা দানাদার খাদ্যের পরিবর্তন ঘটলে ক্যালসিয়ামের স্বল্পতা দেখা দিতে পারে।

রোগের লক্ষন ঃ

- গাভীর পেশীর দুর্বলতা ও শিথিলতা দেখা যায়;
- চোখ ও থুতনীতে কাঁপুনী দেখা যায়;
- গাভী বুকের উপর ভর দিয়ে শুয়ে থাকে;
- গাভী ঝিমুতে থাকে এবং ধীরে ধীরে জ্ঞান লোপ পাইতে থাকে;
- এক পাশে ভর করে শুয়ে মাথা বাঁকিয়ে পেটের উপর রাখে;
- শরীরের চামড়া ও অন্যান্য অঙ্গ ঠান্ডা হয়ে যায়;
- মুখের সম্মুখ ভাগ (Muzzle) শুষ্ক হয়ে যায়;
- চোখ শুষ্ক এবং চোখের মনি প্রসারিত হয়ে যায়;
- অনেক সময় জরায়ু বের হয়ে আসে;

- পাকস্থলীর স্পন্দন কমে যাওয়ার কারণে পায়খানা আসে না এবং কোষ্ঠ কাঠিন্য দেখা যায়;
- গাভী শরীরের যে কোন একপাশে ভর করে শুয়ে পড়ে। ক্রমান্নয়ে পেশীর শিথিলতা বৃদ্ধি পায় এবং গাভী কোন অবস্থাতেই বসে থাকতে পারে না;
- গাভী পার্শ্ব অবস্থায় থাকার কারণে পেট ফোলা (Bloat) দেখা দেয়। মাংসপেশীর পক্ষাঘাতের কারণে প্রস্রাবও বন্ধ হয়ে যায়। দ্রুত উপযুক্ত চিকিৎসা প্রয়োগ করতে না পারলে গাভীর মৃত্যু হয়।

মিল্কফিভার রোগে প্রাথমিক করণীয়ঃ

১। গাভী মাটিতে শুয়ে পড়ার আগে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব চিকিৎসার ব্যবস্থা করা, সে ক্ষেত্রে প্রশিক্ষিত ভেটেরিনারিয়ানের পরামর্শ গ্রহণ করতে হবে;

২। একেবারে মাটিতে শুয়ে পড়ার আগ পর্যন্ত বুকের উপর ভর দিয়ে বসিয়ে রাখার চেষ্টা করতে হবে;

৩। শুয়ে পড়া গাভীর মেঝে পিচ্ছিল হলে অমসৃন জায়গায় সরিয়ে নিতে হবে। খোলা যায়গা হলে উপরে একটা আচ্ছাদনের ব্যবস্থা করতে হবে।

মিল্কফিভার রোগে চিকিৎসা প্রদানঃ

মিল্কফিভার রোগে চিকিৎসা ভেটেরিনারিয়ানের পরামর্শক্রমে করতে হবে। চিকিৎসার জন্য ক্যালসিয়াম বোরোগ্লুকোনেট ২৫% শিরার মধ্যে ধীরে প্রয়োগ করতে হবে। পরবর্তীতে চামড়ার নীচে অথবা মাংশে প্রয়োগ করা যায়।

মিল্কফিভার রোগ প্রতিরোধ ব্যবস্থা ঃ

বাচ্চা প্রসবের পুর্বে নিম্নোক্ত সতর্কতা ব্যবস্থা অবলম্বন করলে মিল্কফিভার রোগ প্রতিরোধ করা সম্ভব।

- বাচ্চা প্রসবের ২ সপ্তাহ পূর্ব হতে খাদ্যে ক্যালসিয়ামের পরিমান প্রতিদিন ২০ গ্রামের কম সরবরাহ করতে হবে;
- শুষ্ক অবস্থায় খাবারে ক্যালসিয়ামের পরিমান কমিয়ে দিতে হবে (৮০-১০০ গ্রামের কম/দিন);
- গর্ভাবস্থার শেষ মাসে খাদ্যে ফসফরাসের অনুপাত ক্যালসিয়ামের তুলনায় বৃদ্ধি করতে হবে (ক্যালসিয়াম : ফসফরাস : = ১:৩);

- গর্ভাবস্থার শেষ ৩ সপ্তাহে এমোনিয়াম ক্লোরাইড খাবারের সাথে সরবরাহ দিলে মিল্ক ফিভার রোগ প্রতিরোধ করা যায়;
- বাচ্চা প্রসবের পুর্বে ভিটামিন ডি৩ ব্যবহার করলে এ রোগ প্রতিরোধ করতে সহায়ক হয়;
- বাচ্চা প্রসবের ১২ ঘন্টা পূর্বে, বাচ্চা প্রসবের পর এবং বাচ্চা প্রসবের ২৪ ঘন্টার মধ্যে ক্যালসিয়াম জেল খাওয়ালেও মিল্কফিভার রোগ প্রতিরোধ করা সম্ভব;
- বাচ্চা প্রসবের পূর্বে পানির সাথে চুন খাওয়ানো যেতে পারে;
- গর্ভবতী গাভীকে অতিরিক্ত মেদবহুল বা মোটা হতে দেয়া উচিৎ নয়;
- গাভীর মিল্কফিভার হওয়ার পূর্ব ইতিহাস জানা থাকলে বাচ্চা প্রসবের পর হতেই ঘন ঘন লক্ষণসমূহ পর্যবেক্ষণ করতে হবে এবং প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নিতে হবে।

চিত্র ঃ মিল্কফিভারে আক্রান্ত গাভী

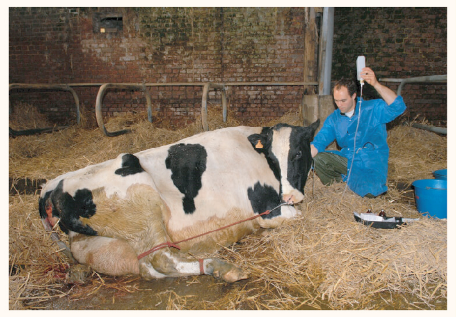
চিত্র ঃ মিল্কফিভারে আক্রান্ত গাভীর চিকিৎসা

গবাদিপশুর কিটোসিস (Ketosis):

কিটোসিস দুগ্ধবতী গাভীর জন্য একটা গুরুত্বপূর্ণ বিপাকীয় সমস্যা। গাভীর লিভার কর্তৃক ফ্যাটি এসিডকে গ্লুকোজ-এ রূপান্তরে বিঘ্ন ঘটার ফলে রক্তে কিটোনবডির পরিমান বৃদ্ধি পাওয়ায় এ সমস্যা দেখা দেয়। কিটোসিস গাভীর দুধ উৎপাদনের সাথে সম্পর্কিত যা অধিক দুধ উৎপাদন এবং তুলনামূলক স্বল্প শক্তি উৎপাদন এর ফলে সৃষ্ট। সাধারনত: বাচ্চা প্রসবের ৭ দিন পূর্ব হতে ৩০ দিন পর্যন্ত বা সর্বোচ্চ দুধ উৎপাদনকালে গাভীতে কিটোসিস সমস্যা হয়ে থাকে। ক্ষুধামন্দা, গাভীর ওজন হ্রাস পাওয়া এবং দুধ উৎপাদন কমে যাওয়া প্রধান প্রধান লক্ষণ। অধিক দুগ্ধ উৎপাদন খামারে প্রায় শতকরা ১১-১২ ভাগ গাভী কিটোসিস রোগে আক্রান্ত হয়ে থাকে ফলে খামারী আর্থিকভাবে ভীষন ক্ষতিগ্রস্থ হয়।

কিটোসিস- লক্ষণ অনুসারে দু'ভাগে ভাগ করা যায়-

১) বিধ্বস্ততা অবস্থা: (ক)অবসাদগ্রস্থতা (মাথা নিচু করে রাখা); (খ) শরীরে শক্তিহীনতা (খাদ্যে শুষ্ক পদার্থ গ্রহন হ্রাস পাওয়া); (গ) দুধ উৎপাদন কমে যাওয়া; (ঘ) শরীরের ওজন কমে যাওয়া; (ঙ) শরীরের তাপ বৃদ্ধি পাওয়া; (চ) শ্বাস-প্রশ্বাসে কিটোনের মিষ্টি গন্ধ পাওয়া ইত্যাদি।

২) স্নায়ুতন্ত্র সংশ্লিষ্টতা; (ক) উত্তেজিত অবস্থা; অসংলগ্নতা এবং আক্রমাত্বকভাব; (খ) অস্বাভাবিকতা- মাটি খাওয়া, পার্শবর্তী বেড়া, দেয়াল বা খুটি কামড়ানো বা চাটতে থাকা, বৃত্তাকারে ঘোরা, মাথা উচু করে রাখা, মাথা কোন কোণায় চাপ দিয়ে রাখা, ডাকা ডাকি করা, ইত্যাদি।

কিটোসিস প্রবনতার সংকটময় সময়ঃ

(ক) প্রসব-পূর্ব পর্ব: যদিও কিটোসিস দুধ উৎপাদনের সাথে সম্পৃক্ত কিন্তু বাচ্চা প্রসবের ৭ দিন পূর্বেও লক্ষণসহ সমস্যাদি দেখা দিতে পারে। এ সময় গাভী ক্রমান্নয়ে শুষ্কপদার্থ জাতীয় খাদ্য গ্রহন কমে যায় এবং পুষ্টিহীনতা দেখা যায়। গর্ভে বাচ্চার বৃদ্ধির সাথে সাথে গ্লুকোজ ও পুষ্টির চাহিদা বৃদ্ধি পায় অপরদিকে খাদ্যে পুষ্টি ঘাটতির কারণে কিটোসিস- প্রবনতা দেখা যায়। শরীরের রোগ প্রতিরোধ কমে যাওয়ার ফলে অন্যান্য সংক্রামক ও বিপাকীয় রোগের আশংকা বৃদ্ধি পায়।

(খ) প্রসবত্তোর পর্ব: বাচ্চা প্রসবের প্রথম সপ্তাহের মধ্যেই অধিক দুধ উৎপাদনের জন্য দ্রুত পুষ্টির প্রয়োজন হয়ে পড়ে এবং কিটোসিসের আশংকা দেখা দেয়। দুধ উৎপাদনের জন্য প্রচুর পরিমানে গ্লুকোজের প্রয়োজন হয় যা লিভার কর্তৃক বিপাকীয় প্রক্রিয়ার উপর নির্ভর করে। সাধারনত: বাচ্চা প্রসবের পর সুস্বাদু খাদ্য উপাদান সরবরাহ করার কারণে শুষ্ক পদার্থের অভাব ঘটে যার ফলে দুধ উৎপাদনের সাথে ভারসাম্য রক্ষা করা সম্ভব হয় না।

নুতন উপাদান বিশিষ্ট খাদ্যের সাথে রুমেন মাইক্রোফ্লোরা খাপ খাওয়াতে না পারার কারণে খাদ্য হজম বাধাগ্রস্থ হয় এবং রুমেনে এসিডোসিস দেখা দেয়। ফলে গাভীর রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা হ্রাস এবং কিটোসিস-এর প্রবনতা বৃদ্ধি পায়। চিকিৎসা প্রদানের পর গাভীর পুন: খাদ্য বৃদ্ধি পেতে থাকে এবং গাভী সুস্থ হতে থাকে।

রোগ নির্ণয়ঃ

১) কিটোসিসের লক্ষণসমূহ হতে রোগ নির্ণয়;
২) দুধ ও প্রসাব পরীক্ষার মাধ্যমে কিটোন বডি নির্ণয়।

কিটোসিস চিকিৎসা ও প্রতিরোধঃ

কিটোসিস রোগের চিকিৎসা ভেটেরিনারিয়ানের পরামর্শক্রমে করতে হবে।
চিকিৎসার মূল লক্ষ্য হলো রক্তে গ্লুকোজের পরিমান পুণ:রুদ্ধার করা। সে মোতাবেক গ্লুকোজের পরিমান বৃদ্ধিকল্পে নিম্ন পদ্ধতিগুলি অনুসরণ করা প্রয়োজন।

- খাদ্যে শুষ্ক পদার্থ গ্রহনে উৎসাহিত করা, ভালমানের খড়, সাইলেজ বা আঁশযুক্ত খাদ্য ও দানাদার খাদ্য সরবরাহ করা;
- কিটোসিস প্রতিরোধ মূলক চিকিৎসা- প্রোপাইলিন গ্লাইকল দিয়ে চিকিৎসা প্রদান, খাদ্যে গ্লুকোজ যুক্ত করা, প্রয়োজনে শিরায় গ্লুকোজ প্রয়োগ করা;
- করটিকোষ্টেরয়েড হরমোন মাংসে প্রয়োগ এবং একইসাথে গ্লুকোজ সরবরাহ করা;
- খাদ্যে এডেটিভ যুক্ত করা সাধারণত: খাদ্যে ইষ্ট যুক্ত করে শুষ্ক পদার্থ গ্রহনে উৎসাহিত করা যায়;
- গর্ভাবস্থায় গাভীকে অধিক মোটা বা মেদযুক্ত না করা।

চিত্র ঃ কিটোসিসে আক্রান্ত গাভী

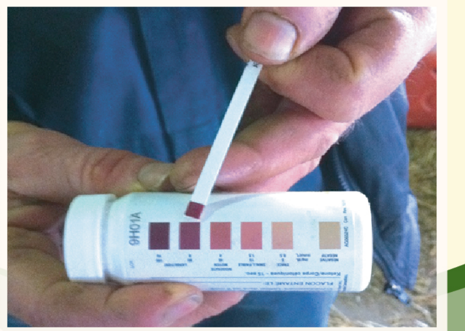
চিত্র ঃ কিটোসিস পরীক্ষার কিট

গবাদিপশুর রুমিনাল এসিডোসিস (Ruminal Acidosis)

রুমিনাল এসিডোসিস বা রুমেন এসিডোসিস এক প্রকার বিপাকীয় রোগ যা গবাদিপশুতে দেখা যায়। অন্যান্য বিপাকীয় রোগ সমূহের ন্যায় রুমিনাল এসিডোসিস রোগের লক্ষণ প্রকাশ পায় তবে উপযুক্ত লক্ষণ ছাড়াও এ রোগ হতে দেখা যায়। গবাদিপশুর রুমেনের স্বাভাবিক পিএইস ৬.৫-৭.০ হতে কমে ৫.৫ নেমে গেলে সে অবস্থাকে রুমিনাল এসিডোসিস বলে।

রুমিনাল এসিডোসিসের কারণঃ

অধিক পরিমানে অতিদ্রুত-পাচ্য শর্করা জাতীয় খাদ্য গ্রহন রুমিনাল এসিডোসিসের প্রাথমিক কারণ। গম, ভুট্টা, যব, আলু, ভাত সহ অন্যান্য দানাদার শর্করা জাতীয় খাদ্য গ্রহন রুমিনাল এসিডোসিস সৃষ্টি করে থাকে। তীব্র এসিডোসিস প্রায়ই গবাদিপশুর মৃত্যুর কারণ হয়ে থাকে। আমাদের দেশে ঘাসের তুলনায় অধিক পরিমানে দানাদার খাদ্য খাওয়ানোর কারণে নাতি-তীব্র রুমিনাল এসিডোসিস দেখা দেয়।

রুমিনাল এসিডোসিসের লক্ষণঃ

তীব্র এসিডোসিস সচরাচর গবাদিপশুর মৃত্যু ঘটায় যদিও তার আগে অসুস্থতার লক্ষণ এবং লিভারের ক্ষত (Abscesses) হয়ে থাকে। তাছাড়া পশুকে ভীষন বিষন্ন দেখায়, খাবার খাওয়া বন্ধ হয়ে যায়, হার্টের রেট বৃদ্ধিসহ ডায়রিয়া দেখা দিতে পারে।

নাতি-তীব্র লক্ষণ সমূহ:

- খাদ্য গ্রহণ কমে যাওয়া;
- শরীরের ওজন কমে যাওয়া এবং শারীরিক অবস্থার অবনতি;
- অজানা কারণে ডায়রিয়া দেখা দেয়;
- শরীরের তাপ বৃদ্ধি পাওয়া;
- হার্টের রেট ও শ্বাস-প্রশ্বাস বৃদ্ধি পাওয়া।

রুমিনাল এসিডোসিসের চিকিৎসাঃ

প্রকৃতপক্ষে নাতি-তীব্র রুমিনাল এসিডোসিস কালে বাইরের কোন লক্ষণ প্রকাশ না হওয়ার কারণে ঐ অবস্থায় চিকিৎসা প্রদান করা সম্ভব হয় না তবে রোগ লক্ষণ দেখা দিলে প্রাণিচিকিৎসকের পরামর্শ মত ব্যবস্থা নিতে হবে।

রুমিনাল এসিডোসিসের প্রতিরোধ ব্যবস্থাঃ

- গবাদিপশকে সীমিত পরিমানে দ্রুত-পাচ্য শর্করা জাতীয় খাদ্য সরবরাহ হলো মূল প্রতিরোধ ব্যবস্থা। সেজন্য প্রয়োজন মত উন্নতমান সম্পন্ন সুষম খাদ্য সরবরাহ করা;
- খদ্যে অধিক পরিমানে দানাদার এবং অল্প পরিমানে আঁশযুক্ত খাবার প্রদান করলে নাতি-তীব্র রুমিনাল এসিডোসিস দেখা দেয় এবং একই ঘটনা ঘটতে পারে গাভীর বাচ্চা প্রসবের পূর্বে যখন খামারী গাভীর খাদ্যের উপাদান পরিবর্তন করে থাকে;
- লম্বা আঁশযুক্ত খাবার রুমিনাল এসিডোসিস তৈরী প্রতিরোধে সহায়তা করে। লম্বা আঁশযুক্ত খাবার বেশীক্ষণ চাবানোর কারণে অধিক লালা সৃষ্টি হয় এবং জাবর কাটার পরিমান বৃদ্ধি পায় যা এসিডোসিস প্রতিরোধে সহায়ক;
- গবাদিপশুর খাদ্য অতি সতর্কতার সাথে প্রস্তুত করা উচিৎ, যেখানে সুষম খাদ্যের সাথে সোডিয়াম বাই কার্বোনেট বা পটাশিয়াম বাই কার্বোনেট যুক্ত করা যেতে পারে;
- গবাদিপশুকে সম্পুরক হিসাবে সরাসরি রুমিনাল ফ্লোরা খাওয়ালে নাতি-তীব্র রুমিনাল এসিডোসিসের প্রকোপ কম থাকে।

চিত্র ঃ এসিডোসিসে আক্রান্ত গাভী

গবাদিপশুর গ্রাস টিটানী (Grass Tetany):

গবাদিপশুর গ্রাস টিটানী একটা সাধারন কিন্তু গুরুত্বপূর্ণ বিপাকীয় রোগ যাকে ইংরেজীতে হাইপোম্যাগনেসেমিয়া বা ষ্ট্যাগার বলা হয়। গবাদিপশুর শরীরের পেশী এবং স্নায়ুর স্বাভাবিক কার্যকারীতার জন্য ম্যাগনেসিয়ামের অতি জরুরী। যখন খাদ্যের সাথে পর্যাপ্ত পরিমান ম্যাগনেসিয়াম সরবরাহ না থাকে অথবা পটাশিয়ামের অভাবে ম্যাগনেসিয়াম শোষনে ব্যাঘাত ঘটে তখন গাভীতে গ্রাস টিটানী রোগ দেখা দেয়।

রোগের কারণঃ

গাভীর রক্তে ম্যাগনেসিয়ামের পরিমান প্রয়োজনের তুলনায় কমে গেলে গ্রাস টিটানীর লক্ষণসমূহ প্রকাশ পায়। গ্রাস টিটানী রোগ সচরাচর গাভীর যখন অধিক ম্যাগনেসিয়ামের প্রয়োজন হয়, যেমন- বাচ্চা প্রসবের পূর্বে এবং বাচ্চা প্রসবের পর পরই অথবা নুতন গজানো, অধিক সতেজ সবুজ ঘাস বা চারা শষ্য গাছ মাঠে চরে খায়। অন্যান্য বিপাকীয় রোগের ন্যায় বয়স্ক এবং ধকলযুক্ত গাভীতে গ্রাস টিটানী রোগে আক্রান্তের প্রবনতা বেশী থাকে।

রোগের লক্ষণঃ

- গ্রাস টিটানী রোগ লক্ষণ অনুযায়ী দুই ভাগে দেখা যায়-তীব্র ও নাতি-তীব্র;
- গ্রাস টিটানী রোগে আক্রান্ত পশু চলাফেরা করতে চায় না;
- শরীরে কাঁপুনী থাকে, চলতে গেলে পড়ে যেতে থাকে;
- অন্ধের ন্যায় লক্ষণ প্রকাশ পায়;
- মাটিতে শুয়ে পড়তে চায়;
- খিচুনীসহ বিষন্নতা ও ঝিমুনী লক্ষণ দেখা যায়;
- অবস্থা ক্রমান্নয়ে খারাপ হতে থাকে এবং পশু মারা যায়;
- অনেক ক্ষেত্রে কোন লক্ষণ প্রকাশ পাওয়ার আগেই মৃত্যু ঘটতে পারে।

রোগের চিকিৎসাঃ

প্রকৃত পক্ষে ম্যাগনেসিয়াম সলুসন প্রয়োগ মূল চিকিৎসা। ম্যাগনেসিয়াম সলুসন পশুর চামড়ার নীচে একসাথে বিভিন্ন স্থানে প্রয়োগ করতে হয়। ম্যাগনেসিয়াম সলুসন প্রাণিচিকিৎসকের পরামর্শক্রমে শিরাতে প্রয়োগ করা যায়। শিরায় প্রয়োগের জন্য ক্যালশিয়াম, ম্যাগনেসিয়াস, ফসফরাস ও গ্লুকোজের সমন্নয়ে তৈরী সলুশন ব্যবহার করা যেতে পারে।

রোগের প্রতিরোধ ব্যবস্থাঃ

- ম্যাগনেসিয়াম সরবরাহ সহ ম্যাগনেসিয়াম দিয়ে খড় প্রক্রিয়াজাত করে সরবরাহ করা যেতে পারে;
- বাচ্চা প্রসবের আগে ঝুঁকিপূর্ণ মাঠে গরু-ভেড়া চড়ানো উচিৎ নয়;
- সম্ভব হলে ঘাসের মাঠে পটাশিয়ামের পরিমান কমিয়ে আনার ব্যবস্থা নেয়া;
- পশুর চেটে খাওয়ার জন্য অথবা খাবারের সাথে ম্যাগনেসিয়াম লবন সরবরাহ করলে গ্রাস টিটানী রোগ প্রতিরোধ করা যায়;
- অধিক সতেজ সবুজ ঘাস বা সদ্য চারা শষ্য গজানো মাঠে পশু চড়ানো যাবে না;
- পশুকে সব সময় ধকলমুক্ত রাখতে হবে।

চিত্র ঃ গ্রাস টিটানীতে আক্রান্ত গাভী